হ্যারল্ড পিন্টার : তাঁর নাটক ও রাজনীতি

সাগর বিশ্বাস

"If. I were to state any moral precept it might be Beware of the writer who put foreard his concern for you to embrace, who lives you to embrace, who lives you in. no doubt as to his worthiness, his ultruism, who declares that his heart is in the right place, and ensures that it can be seen, in full view, a pulsating mass where his characters ought to be"

বলেছিলেন হ্যারল্ড পিন্টার ১৯৬১ সালে ব্রিস্টলে ন্যাশনাল স্টুডেন্ট ড্রামা ফেস্টিভ্যালে। ততদিনে ব্রিটিশ মঞ্চ, বেতার ও দূরদর্শনের জন্য তিনি লিখে ফেলেছেন প্রায় এক ডজন নাটক যা লন্ডনের নাট্যামোদী দর্শক ও সমালোচক মহলে বিপুল বিতর্ক এবং আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। জনপ্রিয়তার কথা বলছি না, কারণ তাঁর সর্বাধিক আলোচিত নাটক 'দি বার্থডে পার্টি' ১৯৫৮ সালে মঞ্চস্থ হওয়ার পর তীব্র বিরূপ সমালোচনার চাপে ও দর্শক বিমুখতায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সে তথ্য আমাদের জানা আমাদের এও জানা যে ১৯৮২ সালে কলকাতার মঞ্চে এই নাটকটি ('তেত্রিশতম জন্মদিন') উপস্থাপিত করে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুমুল বিতর্কের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কারন কলকাতা তখনও পিন্টারের নাট্যভাষা ও চরিত্রচিত্রন সম্যক গ্রহণ করতে পারেনি। ইওরোপে কিন্তু অনতিকালের মধ্যেই পিন্টারের মূল্যায়ন হয়েছে, তাঁর ওই নিন্দিত নাটকও বন্দিত হয়েছে, তিনি 'রাগী' চিহ্ন ধারণ করেও জনপ্রিয়তা পেয়েছেন, কাফ্কার মতো তাঁরও নাট্যভাবনা ও সংলাপশৈলি পৃথক মর্যাদা অর্জন করেছে ('পিন্টারেস্ক')। ক'জন লেখক নিজের নামকে এমন আভিধানিক শব্দে প্রত্যক্ষ করার যোগ্যতা বা সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। 'কাফ্কায়েস্ক' -এর মতো বহু- ব্যবহৃত 'পিন্টারেস্ক' শব্দটিও তাই অনিবার্যভাবে অক্সফোর্ড অভিধানে স্থান পেয়ে যায়।

মানুষটি কিন্তু তাঁর সাহিত্যজীবন শুরু করেছিলেন কবিতা দিয়ে। কিশোর বয়স থেকেই ভালোবেসেছিলেন কবিতা। লন্ডনের 'পোয়েট্রি পত্রিকায় তাঁর কবিতা বেরতো, কবির নাম ছাপা হত হ্যারল্ড পিন্টা। ১৯৫০ সালে তাঁর প্রথম কবিতা - সংকলন প্রকাশিত হয়। আরও একটি ভালোবাসা ছিল তাঁর—সেটা হল ক্রিকেট। লন্ডনে 'গাইটিস ক্রিকেট ক্লাব' নামে একটি সংস্থা ছিল। ১৯৩৭ সালে 'লুপিনো লেন' নামক একটি শিল্পী গোষ্ঠীর উদ্যোগে এর প্রতিষ্ঠা। উদ্দেশ্য ছিল কেবলমাত্র থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত ক্রিকেটপ্রেমীদের খেলার সুযোগ করে দেওয়া। পরে সাহিত্য চলচ্চিত্র জগতের ক্রিকেটারদেরও নেওয়া শুরু হয়। হ্যারল্ড পিন্টার এই ক্লাবে খেলতেন শুধু নয়, ১৯৭২ সালে তিনি ক্লাবের চেয়ারম্যানও হন। সাধারনত ইংলন্ডের ঘরোয়া কাউন্টি খেলাতেই অংশ নিত ক্লাব। এখনও নেয়। ১৯৯৬ সালে আয়ান স্মিথের অধিনায়কত্বে 'গাইটিস' ভারত সফরে এসেছিল। তাঁর আবাল্য ক্রিকেট প্রীতি বোঝাতে বড় হয়ে পিন্টার জানিয়েছিলেন যুদ্ধ ও যুদ্ধ পরবর্তী সময়ের যতবার তাঁদের বাড়ি বদল করতে হয়েছে, কোনোবারই তিনি তাঁর ক্রিকেট ব্যাটটি হাতছাড়া করেননি। এ সম্পর্কে তাঁর সরস মন্তব্য : 'I tend to think that cricket is the greatest thing God ever created on earth-certainly greater than sex, although sex isn't too bad either.'

জন্মেছিলেন পূর্ব - লন্ডনের হ্যাকনি অঞ্চলের এক শ্রমিক বস্তিতে ১৯৩০ সালের ১০ অক্টোবর। বাবা পেশায় ছিলেন পোশাক তৈরির কারিগর। কিন্তু সারাজীবন যে তিনি একই কাজ করছেন তা নয়, যুদ্ধের সময় এয়ার রেড ওয়ার্ডেনের কাজও করেছেন। বেঁচেছিলেন ৯৬ বছর। বাবা - মা ইহুদি হওয়ায় ছেলেবেলা থেকেই পিন্টার জাতি বৈষম্যের যন্ত্রণা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রারম্ভে লন্ডনে জার্মান বোমাতঙ্কে অনেকের মতো বাবা - মা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাঁকেও চলে যেতে হয় কর্ণওয়ালে। মেগাভিসে থেকে মাইল পাঁচেক দূরে সমুদ্র উপকুলবর্তী জায়গা। সেখানকার এক দুর্গের মধ্যে প্রায় বন্দি অবস্থায় দীর্ঘদিন কাটাতে হয় তাঁকে। লন্ডনে ফিরে আসার পরেও সেই বোমাতঙ্ক বহুকাল তাঁকে তাড়া করেছে। তাঁর কথায়— 'The condition of being bombed has never left me.' ১৯৪৯ সালে ফাসিবাদের বিরুদ্ধে কথা বলার জন্য তাঁর ওপর আক্রমণ নেমে আসে। বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষা নিয়ে যুদ্ধে যেতে অস্বীকার করায় তাঁকে গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়। সেখানে তিরিশ পাউন্ড জরিমানা দিয়ে আইনি - বিচারে খালাশ পান। নিজেকে conscientious objector হিসেবে যুদ্ধবিরোধি বলে ঘোষণা করেন। পরিষ্কার জানিয়ে দেন ভবিষ্যতেও কোনওদিন যুদ্ধের ডাক এলে তিনি অংশগ্রহণ করবেন না।

এ তথ্যগুলি স্মরণে রাখব এজন্য যে গত শতাব্দীর তিন ও চারের দশকব্যাপী ইওরোপ তথা সমগ্র বিশ্বে যে বিভীষিকাময় অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল তার মধ্যেই কেটেছে পিন্টারের শৈশব ও কৈশোর। তাঁর মানসভূমি নির্মিত হয়েছে সেই অদ্ভুত অন্ধকার আবর্তে। সময়ের সেই নির্মম অভিঘাত তাঁর কবিতার ভাষা নির্মাণ করেছে, পরবর্তীকালে নাটকের চরিত্র ও সংলাপ। স্কুলজীবন থেকে যে কবিতার প্রতি আসক্ত ছিলেন, সেই কাব্য ভাষা তাঁর নাটককেও প্রভাবিত করেছে লক্ষণীয়ভাবে। তাই বিশ্ব নাট্যসাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েও জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন বলেন আর নাটক লিখবেন না, তখনও কবিতাকে ছুটি দেওয়ার কথা ভাবেন না। অতএব অনিবার্যভাবেই দেখা যায় তাঁর ঐতিহাসিক নোবল ভাষণের মধ্যে কেবল পাবলো নেরুদার কবিতাই স্থান পায় না— চেতনার আঘাত হানা স্বরচিত কবিতাতেই তাঁর উপসংহার নির্মিত হয়।

তাঁর নাটকের প্রতি অনুরাগও জন্মেছিল স্কুল জীবন থেকে। হ্যাকনি গ্রামার স্কুলের নাট্যাভিনয়ে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথ ও রোমিওর ভূমিকায় সকলের সপ্রশংস মনোযোগ আকর্ষণ করেন। বড় হয়ে ১৯৪৮ সালে লন্ডনের রয়্যাল একাডেমি অফ ড্রামাটিক আর্ট - এ ভর্তি হন। ১৯৫১ সালে সেন্ট্রাল স্কুল অফ স্পিট অ্যান্ড ড্রামাতে ঢুকেও একটি ভ্রাম্যমান নাটকের দলে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে আয়ার্ল্যান্ড পরিভ্রমণে বেরিয়ে যান। এরপর 'ডেভিড ব্যারন' ছদ্মনামে আরও বছর পাঁচেক আঞ্চলিক রিপার্টরী থিয়েটারে অভিনেতা হিসেবে যুক্ত থাকেন। এখান থেকেই আমরা দেখি নাট্যকার হিসেবে তাঁর ক্রম - উত্তরণ। ১৯৫৬ সালে বিয়ে করলেন খ্যাতিময়ী অভিনেত্রী ভিডিয়েন মার্চেন্টকে।' ৫৮ সালে জন্ম হল তাঁদের প্রথম সন্তান ড্যানিয়েল পিন্টারের। পরে অবশ্য ভিভিয়েনের সাথে বিচ্ছেদ হলে ১৯৮০ সালে বিয়ে করেন লেডি আন্তোনিও ফ্রেজারকে। ১৯৫৭ সালে ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের নাট্যবিভাগের জন্য মাত্র চারদিনে লিখলেন প্রথম নাটক 'দ্য রুম'। এক বছরে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিনীত হল তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক বা 'দ্য বার্থডে পার্টি'। পরের বছর এ নাটকের অভিনয় হল হ্যামারস্মিথে লিরিক অপেরা হাউসে। ঝড় বয়ে গেল সমালোচনার। পিন্টার বললেন— প্রকৃতপক্ষে এই সমালোচকেরা হল একটা অপ্রয়োজনীয় গোষ্ঠী। নাটক দেখে দর্শকদের কী প্রতিক্রিয়া হবে তা বলে দেবার জন্য আমাদের কোনও সমালোকের দরকার নেই। আবার দর্শক কী চায় তা নিয়েও তাঁর কোনও মাথাব্যথা থাকে না। তাঁর অভিনেতাদের তিনি কেবল এ কথাটাই বোঝাতে চান যে জনগনেশকে খুশি করার কথা মাথায় রাখার দরকার নেই—যেটা করা প্রয়োজন শুধু সেটুকুই নিষ্ঠার সঙ্গে করে যেতে

হবে। উত্তেজনার মাথায় কখনো হয়তো বলেছেন 'fuck the audience' কিন্তু আসলে তাঁর মতে নাট্যাভিনয় হচ্ছে দর্শক অভিনেতার মধ্যে একধরনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা। সেখানে অভিনেতারই জেতা প্রয়োজন। আমাদের কৌতূহল জাগে— কী এমন বৈভব রয়েছে তাঁর নাটকে যা নিয়ে বিশ্বজোড়া এত আলোচনা?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এই পৃথিবীর মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক ঘোর ক্রান্তিকাল। এতদিন মানুষের অর্জিত সভ্যতায় যা কিছু চিরন্তন ও শাশ্বত বলে স্বীকৃত ছিল ন্যায় অন্যায়, পাপপুণ্যবোধ—যা কিছু মনুষ্যত্বের কিংবা মানবিক মূল্যবোধের অভিজ্ঞান বলে গৃহীত হত, যুদ্ধ শেষে তা সব অন্তঃসারশূন্য বলে প্রতিভাত হতে লাগল। মানুষের যাবতীয় প্রতিষ্ঠা ও নিরাপত্তা যেন তাসের ঘরের মতো বিধ্বস্ত হয়ে গেল। দেখা দিল সর্বব্যাপী অস্তিত্বের সংকট। চিন্তার জগতে এই সংকটময়তাই জন্ম দিল একধরণের সামাজিক শূন্যতাবোধের। নাটকের ক্ষেত্রে এই শূন্যতাবোধকে অর্থহীনতার মাধমে উপস্থাপিত করা। মানুষের অভিব্যক্তি মূলক বিচিত্র উপাদান নিয়ে বাস্তববাদের বিপ্রতীপে সত্যকে বানিয়ে বলার এক দার্শনিক প্রচেষ্টা। ট্রাজিডি, কমেডি, প্রহসনের বাইরে থেকে যাবতীয় প্রচলিত ইতি বাচকতাকে উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে এগিয়ে চলা এই ধারা যে কেবল যুদ্ধক্লান্ত হাহাকারও বিপর্যয় থেকে পুষ্টি পেয়েছে তাও নয়, পেছনে আর্থ - সামাজিক বিশৃঙ্খলা, রাজনৈতিক ভ্রষ্টাচার ও মূল্যবোধের সার্বিক অধঃপতনের অবদানও কিছু কম নয়।

স্যামুয়েল বেকেট, ইউজিন আয়োনেস্কো, এডওয়ার্ড অ্যালবি, ফ্রানৎস কাফ্‌কা প্রমুখ অ্যাবসার্ড নাট্যকারদের মতো পিন্টারের নাটকেও একধরনের আতঙ্ক, শূন্যতাবোধ, দুর্বোধ্য রহস্যময়তা এবং আপাত যুক্তিহীনতার ব্যাপক উপস্থিতি রয়েছে। এ কারনে অনেকেই তাঁকে অ্যাবসার্ড নাট্যকার বলেছেন। অভিধাটির উদ্ভাবক মার্টিন এসলিনও তাঁর 'থিয়েটার অফ দ্য অ্যাবসার্ড' গ্রন্থে পিন্টারকে এই গোত্রভুক্ত করেছেন। করাটাই স্বাভাবিক। কারণ তাঁর নাটকে ও কথায় যখন অ্যাবসার্ড দর্শনের নৈরাশ্য ও শূন্যতা প্রকটিত হয় আপাতবিচারে এই গোত্রভুক্তিতে বড় একটা বাধা থাকে না। তবু এই সিদ্ধান্তকে অনেকটা সরল সিদ্ধান্ত বলে মনে হয়। তাঁর নাটকগুলির অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে ধরা পড়ে যে বিশুদ্ধ অ্যাবসার্ড নাটকের বাহ্যিক পরিপার্শ্বে ও নাট্যক্রিয়ায় যে বাস্তবতার অভাব দেখা যায়, সামগ্রিক বিচারে পিন্টারের নাটকে তারই অভাব রয়েছে। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররাও সাধারণ পরিচিত গন্ডি থেকে উঠে আসা। চেহারায়, চালচলনে, কথাবার্তায়, ক্রিয়াকান্ডে তারা যেন মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত চরিত্রের অনুরূপ। এই শ্রেণির মানুষ সাধারণত কথা বলতে গেলে হোঁচট খায়, আনমনা হয়ে যায়, চুপ করে থাকে, মিথ্যে কথা বলে। পিন্টারের চরিত্রগুলির মধ্যে এই খুঁতগুলো পুরোমাত্রায় বিদ্যমান। জন রাসেল ব্রাউনও মনে করেন,

"Pinter's characters 'Inhabitate same world' as himself so that their reality is imanginary. Their strength and conviction depend on Pinters sensitivity to the forces moving within them and not on his observation of physical facts or social environment. Art the end of the play they are 'finished', except as they go on living. in thhe minds of the witer, the actors and the audience." চরিত্রের সঙ্গে তাঁর তফাৎ বোঝাতে পিন্টার নিজে বলেছেন, "The only difference between them and me is that they don't arrange and select. I do the donkey work. But they carry the can. I think we're all in the same boat." বস্তুত বেকেটের 'ওয়েটিং ফর গোডো'র এস্ট্রাগন, ভ্লাদিমির, লাকি কিংবা পোজার মতো মানুষেরা পিন্টারের নাটকে অনুপস্থিত। তাই মনে হয়, এককথায় অ্যাবসার্ডিস্ট বলা গেলেও, অ্যাবসার্ডিটি তাঁকে পুরোপুরি গ্রাস করতে পারেনি। আসলে যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর যাবতীয় ধ্বংসাত্মক শক্তির লোলুপতা, সভ্যতার সংকট ও মনুষ্যত্বের অধঃপতন দেখে দেখে ক্লান্ত, ক্লিষ্ট, ক্রুদ্ধ তিনি একধরনের নৈরাশ্যবোধে আচ্ছন্ন হন। কঠিন কঠোর কণ্ঠস্বরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, রাজনৈতিক শঠতার বিরুদ্ধে সারাজীবনই তিনি প্রতিবাদ করেছেন। আর এই প্রতিবাদী মনোভঙ্গী তাঁকে অনেকের থেকে পৃথক করেছে। পৃথক করেছে অনেক অ্যাবসার্ডিস্ট থেকেও। তথাপি তাঁর নাটককে অ্যাবসার্ড পদবাচ্য করা হয়েছে। পাশাপাশি একটি নতুন অভিধাতেও চিহ্নিত তাঁর নাটক— 'কমেডি অফ মেনেস'। মেনেস কেন?

"It is generally applied to a situation fraught with menace, hidden fear and therat in threat in which common speech camouflages a ferocious battle for territory" তাঁর লেখা প্রায় সব নাটকেই দেখা যায় একটা অজানা আতঙ্কের ছায়া, চরিত্রগুলি নিরাপত্তাহীনতার শিকার : এই বুঝি তার অবস্থান বা স্থিতিশীলতা কেউ নষ্ট করার জন্য ধেয়ে আসছে, এই বুঝি কেউ তাকে ও তার আশ্রয়কে জবরদখল করার ষড়যন্ত্র করেছে। অর্থাৎ যাবতীয় স্থিতাবস্থা ওলট পালট বা লন্ডভন্ড হওয়ার একাট শ্বাসরোধকারী বাতাবরণ প্রায় সর্বত্র উপস্থিত থাকে। এই সর্বগ্রাসী ভয় ও নিরাপত্তাহীনতা আজকের পৃথিবীর মানবসমাজে এক নিদারুণ সত্য।

তাঁর প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ নাটক 'দ্য রুম' -এ দেখা যাচ্ছে নাম অনুসারে নাটকের স্থান একটা ঘরের মধ্যে আবদ্ধ যে ঘরের বাসিন্দা রোজ ও তার স্বামী বার্ট এক অজানা আশঙ্কায় তটস্থ। দরজায় কেউ কড়া নাড়লেই ভয়—কেউ তাদের এই আশ্রয় থেকে উৎখাত করতে আসছে না তো? আছে মিঃ কিড। মনে হয় যে বাড়িওয়ালা, কিন্তু নিশ্চিত হওয়া যায় না। এরপর একজোড়া নারীপুরুষ আসে। তাদের কাছে শোনা যায় এ বাড়ির ৯নং ঘরটা বাড়ির মালিক ভাড়া দেবে। হায়, রোজ তো সেই ঘরেরই বাসিন্দা। নাটক পরিণতির দিকে এগোতে থাকলে একজন অন্ধ মানুষ প্রবেশ করে— নাম রিলি। রোজ তখন একা ঘরে। সে ভাবে এই লোকটিই তার ঘরের দখল নিতে এসেছে। তার ভয় যখন চরম তার স্বামীর ঘরে আসে। সে রিলিকে বেধড়ক পেটায়— লোকটি মড়ার মতো পড়ে থাকে। হঠাৎ রোজ চীৎকার করে ওঠে 'আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিনা?' তার সেই আর্তচীৎকারের মধ্যে নাটক শেষ হয়। নাটকটি সম্পর্কে এ সময়ের বিশিষ্ট নাট্যকার মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য : "স্পষ্টতই মনে হয়, 'The rook' একটি comedy of menace। এখানে চরিত্র ও ঘটনার ambiguity বিষয় complexity, পরিবেশের hidden fear threat from outside, invasion— সবকিছুই পিন্টারের পরবর্তী অনেক নাটকের মতোই Typical for comedy of menace। অবশ্যই 'The Room'-এর মধ্যে আয়োনেস্কোর ছোঁয়া এবং বেকেটের প্রতিধ্বনি রয়েছে। কিন্তু এ নাটকের মৌলিকত্ব অস্বীকার করা যায় না। Room টি এখানে symbolic। পিন্টারের অনেক নাটকের ঘটনাস্থলই একটা room বা territory। এই room -কে shelter ভাবা হয়, কিন্তু বাইরের invasion ঘটে— সব বিপর্যস্ত হয়ে যায়।

"এ নাটকের ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার আড়ালে রয়েছে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের লন্ডনের অল্প রোজগেরে শ্রমিকদের জীবনযাত্রার কাহিনি। এ সময় শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণি - চেতনা এবং সংঘবদ্ধতার অভাব। ফলে এরা নিজেদের isolated করে তোলে, নিজেদের মধ্যে যথার্থ communication ও গড়ে ওঠে না। প্রতি মুহূর্তে এরা নিরাপত্তার অভাবে ভীত— কোথা থেকে কখন তাদের শেষ আশ্রয়টুকুও হারিয়ে যাবে সে আতঙ্কে তারা তটস্থ। এই মানসিক দূরবস্থাই লরি ড্রাইভার শ্রমিক বার্টের Room -এ প্রকটিত হয়েছে।

"নাটকটির শেষে রোজ হঠাৎ বলে ওঠে, 'I can't see. I can't see'। কী এর তাৎপর্য? রোজ এতকাল জানতো না কেন তার আতঙ্ক, কেন বাইরে থেকে হঠাৎ ঘরে বিপদ ঢুকে পড়ার ভয়। বিপন্ন শ্রমিক শ্রেণির জীবনে এরকম মানসিক অবস্থা যে স্বাভাবিক এবং

অনিবার্য— এই সত্য সম্পর্কে তার সচেতনতা ছিল না। সে এ ব্যাপারে প্রায় অন্ধই ছিল। নাটকের উপসংহারে হঠাৎ সম্ভবত সে সচেতন উপলব্ধিতে পৌঁছে যায়, আবিষ্কার করে কৃষ্ণাঙ্গ রিলি-ই কেবল নয়— নিজেও সে অন্ধ ছিল। রোজের এই অন্ধত্বের expression : I can't see, I can't see."

আবার তাঁর প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাটক 'দ্য বার্থডে পার্টি' শুরু হয় একটি বোর্ডিং হাউসে। পেটি আর তার স্ত্রী মেগ চালায় বোর্ডিংটা। সেখানে বোর্ডার একমাত্র তেত্রিশ বছরের যুবক স্ট্যানলি। নাটকে পিন্টার চরিত্র পরিচিতি স্পষ্ট করেন না। সেখানে অতিসংক্ষেপে বলা আছে : 'Petey, a man in his late thirtees. Lulu, a girl in her twentees. Goldberg, a man in his fiftees. mccann, a man of thirty.' লিপিবদ্ধ। প্রথম অঙ্কে বোর্ডিং -এ আগন্তুক গোল্টবার্গ আর ম্যাক্কানের আগমন, দ্বিতীয় অঙ্কে আগন্তুকদের উদ্যোগে স্ট্যানলির তেত্রিশতম জন্মদিনের বিচিত্র উদযাপন ও শেষ অঙ্কে বিধ্বস্ত স্ট্যানলিনকে নিয়ে আগন্তুকদের সগর্ব নিষ্ক্রমণ।

কে এই স্ট্যানলি? কী তার পরিচয়? কেন বা বোর্ডিং -এ বসবাস? ওই আগন্তুকরাই বা কারা ? নাটকের শুরুতে শোনা গিয়েছিল তারা একটি ঘর ভাড়া নিতে আসছে। কিন্তু কেন? উত্তর নেই এভাবেই তৈরি হয় সাসপেন্স। সেই 'দ্য রুম' নাটকের অনুরূপ সিকোয়েন্স। শেষমেষ কালো গাড়িতে আসা দুই আগন্তুক অদ্ভুতভাবে আধমরা করে স্ট্যানলিকে নিয়ে চলে গেল। কোথায় নিয়ে গেল— কেন নিয়ে গেল— এসব কোনও প্রশ্নেরই স্পষ্ট উত্তর নেই। তাঁর সৃষ্ট চরিত্ররা প্রায়শই নিজেদের উন্মোচন করে না। তাদের আচরণ ও কাজ কর্মের কোনও ব্যাখ্যা করে না। সামাজিক বা রাজনৈতিক অবস্থান বুঝে নিতে হয় কেবল কিছু মন্তব্য, কিন্তু ইঙ্গিত বা কিছু বৈপরীত্যের মাধ্যমে। নাট্যকার কিছু খোলসা করেন না। আর প্লট? পিন্টারের নাটকের গল্প বিশেষ কিছু থাকে না। যেটুকু থাকে তা দু'চার কথাতেই বলে দেওয়া যায়। তিনি চান দর্শক ভাবুক। এটাই পিন্টারের স্টাইল। এক মহিলা দর্শক লিখেছিলেন:

''I would be obliged if you kindly explain the meaning of your play 'The Birthday Party'. These are the points that I do not understand : 1. Who are the two man? 2. Where did Stanley come from? 3. Were they all supposed to be normal? You will appreciate that without the answers to my questions I can not fully understand your play."

জবাবে পিন্টার লিখলেন : ''I would be obliged if you would Kindly explain to me the meaning of your letter. These are the points I do not understand: 1. Who are yor? 2. Where do you come from? 3. Are you supposed to be normal? You will appreciate that without the answers to my questions I can not fully understand your letter."

পিন্টার কোনো ব্যাখা দেননা। তিনি শুধু বলতে পারেন কী ঘটেছিল, লোকগুলো কী বলেছিল এবং শেষমেষ কী করেছিল। উদ্দেশ্য বিধেয় যদি কিছু থাকে তা দর্শক তার জ্ঞানবুদ্ধি, অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির ভিত্তিতে বুঝে নিক।

নাটকটির দ্বিতীয় অঙ্কে একটা শ্বাসরুদ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা আছে। গোল্ডবার্গ ও ম্যাক্কানের অজস্র উল্টোপাল্টা জেরার তোড়ে ভেসে যেতে যেতে স্ট্যানলি যতই বলে সেদিন তার জন্মদিন নয়— ওরা গ্রাহ্য করে না। পেটি, মেগ ও লুলুকে সঙ্গে নিয়ে ওরা জন্মদিন পালনের উৎসবে মাতে। সে উৎসবের অঙ্গ হিসেবে শুরু হয় কানামাছি খেলা। স্ট্যানলির চোখ বেঁধে দেবার পর মঞ্চের এবং জানলা দিয়ে আসা বাইরের আলো ম্লান থেকে ম্লানতর হলে দেখা যায় স্ট্যানলি মেগের গলা টিপে ধরেছে আর সেই মুহূর্তেই পুরো ব্ল্যাক-আউট। পিন্টার নির্দেশে লিখেছেন :

'There is now no light at all through the window, The Stage is in drakness.'

সেই অন্ধকারে গোল্ডবার্গ লুলুর শ্লীলতাহানি করে। লুলু স্ট্যানলির সাহচর্য চায়। খুঁজে পেতে টর্চের আলো জ্বালালে দেখা যায় লুলু টেবিলের উপর শোয়া আর ঈগলপাখির মতো পাখা বিস্তার করে তার শরীরের উপর ঝুঁকে আছে স্ট্যানলি। এইবার গোল্ডবার্গ আর ম্যাক্কান টর্চ নিয়ে এগিয়ে যায় স্ট্যানলির দিকে আর স্ট্যানলি পেছতে পেছতে দেয়ালে বাঁধা পায়। এ সময় তার ভয়ংকর এক নির্বিকার হাসির সাথে সাথে পর্দা নেমে আসে। এই অন্ধকার আর ভায়োলেন্সের মধ্যে টর্চলাইটের ছোট্ট এক আলোকবৃত্তের মাঝখানে দুই আগন্তুকের সাথে স্ট্যানলির প্রতিরোধ সংগ্রাম যেন তারই মৃত্যুসংকেত দিয়ে যায়। কারণ সে ক্রমশ বিচ্ছিন্ন ও হীনবল হয়েছে, তার চশমা কেড়ে নিয়ে তাকে দৃষ্টিহীন করা হয়েছে, আগন্তুকেরা তাকে ধীরে ধীরে অক্টোপাসের মতো ঘিরে ফেলেছে। তাই তার আচরণ ও বাকভঙ্গি ক্রমশ রূঢ় অথচ অস্পষ্ট, বিপজ্জনক অথচ শিশুসুলভ, ক্রুদ্ধ অথচ অসহায়ভাবে মঞ্চ শিহরিত করে। অসাধারণ নাট্য প্রতিভা না থাকলে এমন একটি দৃশ্যবিন্যাস কল্পনা করা যায় না।

শেষ দৃশ্যে ম্যাক্কান স্ট্যানলিকে নিয়ে আসছে— তার পোশাক যেন অন্তিমযাত্রার প্রতীক। একটা চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে ম্যাক্কান আর গোল্ডবার্গ তাকে সুস্থ করার, রক্ষা করার, নতুন জীবন দেবার, মানুষ করার, বিত্তবান করার, সম্মানীয় নেতা করার, মহান করার অজস্র প্রলোভন দিতে থাকে। কিন্তু সে নির্বিকার। ওরা তার মতামত চাইলে সে কেবল আস্তে আস্তে মাথাটা তোলে। পিন্টার লিখছেন, 'They watch him. He draws a long breath which shudders down his body.'

এবার তার শরীরের বঙ্কিম আকৃতি যেন গর্ভস্থ ভ্রূণের মতো—যেন এক জন্মের ইঙ্গিত— যার প্রতিক্রিয়া এক দুর্বোধ্য শব্দের বিস্ফোরণ— উগ্‌গাহ্ — কাহ্‌হাহ্—। পিন্টার নির্দেশকে লিখলেন, 'Stanley's body shudders, relaxes, his head drops, he becomes still again, stooped.' আর কয়েক মুহূর্ত পরেই তাকে চেয়ার থেকে তুলে দরজার দিকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হল। এ সময় সে যেন একটি মৃতদেহ, এভাবেই তাকে অপেক্ষমান কালো গাড়িতে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। জন রাসেল ব্রাউন লিখছেন, ''In these ways, Pinter has chosen events for The Birthday Party Which involve the characters in watch and a death, as well as in a kind of birth and remembrance."

পিন্টার নিজে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন– ''ইস্ট এন্ডে ইহুদিদের মধ্যে আমার বড় হওয়া, তার মধ্যে ফ্যাসিস্ত সন্ত্রাস, বিশ্বযুদ্ধ, নাৎসি বীভৎসতা ইত্যাদি ব্যাপারগুলো আমাকে স্পর্শ করেছিল। জার্মানি এবং পূর্ব ইওরোপের ঘটনাবলী আমার মনকে অনেকটা অধিকার করে রেখেছিল। ধ্বংসযজ্ঞ বা একটা হলোকাস্ট সে সময় আমার লেখাকে প্রভাবিত করেছে। এই প্রেক্ষিতে খুব সচেতনভাবেই আমি 'অ্যাশেস টু অ্যাশেস' লিখেছিলাম। কিন্তু দ্য বার্থডে পার্টি লেখার সময় এতটা সচেতন ছিলাম না। 'দ্য বার্থডে পার্টি'তে আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল গোল্ডবার্গ। এই স্বৈরতন্ত্রীর কথা সবাই জানেন—তোমাকে যা করতে বলা হবে তুমি তাই করবে, তুমি যে ইহুদি এ নিয়ে কোনও সংশয়ের অবকাশ থাকতে পারে না। দুই ব্যক্তির একটা বাড়িতে এসে তৃতীয় এক ব্যক্তিকে তুলে নিয়ে যাওয়া— এটা অবশ্যই হলোকাস্ট আতঙ্কের প্রতিক্রিয়া– একই সঙ্গে আমার ধর্মীয় ও জাতীয়তাবাদী ধারণা কেন্দ্র থেকেই তার বিকাশ"।

আমরা দু'রকম দৃষ্টিকোণ থেকে নাটকটির কাহিনি বিন্যাস দেখে নিতে পারি। প্রথমেই পিন্টারের নাট্যভাবনা অনুসারে মেনে নেব নিছক উদ্ভট কোনো কল্পনা আশ্রয়ে নাটক তৈরি করা যায় না। সেদিক থেকে স্ট্যানলি উদ্ভট কোনো চরিত্র নয়, সে রক্তমাংসের মানুষ,

বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা। তার স্বপ্ন ছিল বড় শিল্পী হওয়া। প্রতিভাও ছিল। কিন্তু কোনও এক অজ্ঞাত ষড়যন্ত্রে তার সমস্ত স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায়— সে এক বোডিং হাউসকে আশ্রয় করে নিজের মতো বেঁচে থাকতে চায়। হঠাৎ সেখানে হাজির হয় গোল্ডবার্গ আর ম্যাক্‌কান। তারা স্ট্যানলির ব্যক্তিগত অধিকারও স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে, তার চশমা ভেঙে তার দৃষ্টি - শক্তি হরণ করে, মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনে তার মুখের ভাষা কেড়ে নেয়, তার ভালোবাসাকে কলুষিত করে এবং সর্বশেষে তাদের মর্জি ও পরিকল্পনামতো তাকে কালো গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে যায়। পিন্টার কথিত হলোকাস্ট এবং স্বৈরাচারী গোল্ডবার্গের কথা মাথায় রেখে আমরা বলতেই পারি আগন্তুকেয়া বুর্জোয়া বিশ্বের ফ্যাসিস্ত - প্রতিনিধি আর স্ট্যানলি সেই ফ্যাসিবাদের অসহায় শিকার এক সাধারণ মানুষ।

অন্যদিক থেকে নাটকটিকে মৃত্যুর রূপক হিসেবেও দেখা যেতে পারে। স্ট্যানলি বোর্ডিং বাড়িতে তার নিজস্ব একটি বৃত্ত নিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল। পেটির অপত্যস্নেহ, মেগির সুপ্ত কামজ অনুরাগবাহিত ভালোবাসা, ললুর অস্ফুট অনুরক্তির মধ্যেই তার সে বৃত্তটি রচিত হচ্ছিল। অকস্মাৎ সেখানে মৃত্যুদূতের মতো হানা দিয়ে গোল্ডবার্গ আর ম্যাক্‌কান তাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল। আবার এটা নবজন্মের দ্যোতক হিসেবে প্রতিস্থাপিত হতে পারে কি না তারও অবকাশ থেকে যায় উপবিষ্ট স্ট্যানলির ভ্রূণভঙ্গিমায়। কিন্তু যেভাবেই দেখিনা কেন, নাট্যসত্য, জীবনসত্যের যে চরম বার্তাটি রেখে যায় তা হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীর ভয়ঙ্কর বাতাবরণে ব্যক্তি—মানুষের কোনও নিরাপত্তা নেই। নিরাপত্তার জন্য সে আশ্রয় খোঁজে, সান্নিধ্য চায়, কিন্তু এই নিরাপত্তার আশা করাটাই অবাস্তব, উদ্ভট, অ্যাবসার্ড।

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই নিরাপত্তার অভাববোধ আর ক্ষমতার প্রতিদ্বন্দ্বিতা কমবেশি তাঁর প্রায় সব নাটকেই উপস্থিত। 'ডাম্ব ওয়েটার' (১৯৫৭)-এ দেখি, বেন আর গুস-দই খুনি কর্মচারী পরবর্তী খুনের জন্য মালিকের হুকুমের অপেক্ষায় একটি হোটেলের ঘরে অপেক্ষমান। এ ঘরের পেছনে একজন ডাম্ব ওয়েটার থাকে যে কিনা এদের পছন্দমতো অর্ডার অনুসারে খাবারের জোগান দেয়। যাকে খুন করতে হবে সে নাকি এ ঘরেই আসবে। স্বভাবত টেনশান বাড়তে থাকে দুজনের—তর্কাতর্কিতে তাদের মধ্যে মারামারিও লেগে যায়। অবশেষে ওই ডাম্ব ওয়েটারের মাধ্যমে স্পিকিং টিউবে মালিকের নির্দেশ আসে। এবার দুজনই দুজনের দিকে ভয় আর বিস্ময়ের চোখে তাকিয়ে থাকে। কিছু করার নেই— তারা তো হুকুমের দাস—ডাম্ব ওয়েটার।

'হোমকামিং ১৯৬৪ পিন্টারের অন্যতম সেরা নাটক। তিনি নিজে এটাকে পরিবার নিয়ে লেখা একটি সত্যিকারের নাটক বলেছেন। বলেছেন, এই নাটকে এমন কিছু উপাদান আছে যা ইহুদিদের খুব পরিচিত— তথাপি এটা কোনো ইহুদি পরিবার নিয়ে লেখা নয়। আমেরিকায় কর্মরত ছেলে টেডি তার আধুনিকা স্ত্রী রুথকে নিয়ে তাদের নর্থ লন্ডনের পুরনো পারিবারিক বাড়িতে আসে। এখানে তার বাবা ও ভাইয়েরা তাকে। মা নেই। এদের নানারকম পেশা—কথাবার্তা, মেজাজও বিচিত্র। রুথ এ বাড়িতে আগন্তুক। শুরু হয়ে যায় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব—অশান্তি-ভায়োলেন্স। শেষ পর্যন্ত টেডি ফিরে যায় আমেরিকা, রুথ থেকে যায় বাড়িতে। ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সে এত বাড়ির নারী প্রতিনিধি তথা কেন্দ্রমণি হয়ে থাকতে চায়, প্রয়োজনে যৌনতার আশ্রয় নিতেও তার দ্বিধা থাকে না। শুরুতে যা ছিল ডেটির হোমকামিং, অন্তিমে তা যেন রুথেরই হোমকামিং। অন্যদিক থেকে মনস্তাত্ত্বিক বিচারে এ যেন 'যার যেথা ঘর' বেছে নেওয়া। নাটকের নিঃশব্দ শেষ দৃশ্যে পারিবারিক - বৃত্ত তেমনই অভিজ্ঞান দেয়। আবার উল্টোদিক থেকে এ পরিণতি যার যার ঘর ভেঙে যাবারও নামান্তর বৈকী। যুদ্ধোত্তর ইওরোপের সমাজ জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এ নাটকে স্পষ্ট দেখা যায়। 'এ স্লাইট এক', 'দ্য লাবার্শ', 'এ নাইট আউট' ও সমগ্রোতীয় নাটক। অনুরূপ ভাবনার প্রতিচ্ছবি দেখা যায় 'ল্যান্ডস্কেপ', 'সাইলেন্স', 'ওল্ড টাইমস', 'ভিক্টোরিয়া স্টেসান,', 'নো ম্যানস্ ল্যান্ড', 'দ্য বেসমেন্ট', 'বিট্রেয়াল' ইত্যাদির নাটকের মধ্যেও।

'বিট্রেয়াল'কে কেউ কেউ যৌন - স্বেচ্ছাচারিতার গল্প মনে করতে পারেন। জেরি তার বন্ধুপত্নী এমার প্রতি আশক্ত। হয়। বন্ধুর রবার্ট তা জানতে পারে। কিছুকাল পরে এমা এক লেখকের প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে জানতে পারে যে তার স্বামী রবার্টও বছরের পর বছর ভিন্ন ভিন্ন নারীতে আশক্ত হয়েছে। তাদের সম্পর্ক শেষ হয়ে যায়। নারীপুরুষের ভোগবাদী মনোভঙ্গি ছাপিয়ে এ নাটক দেখাতে চায় মানুষের বিশ্বাস হননের গোপন কৌশল, যৌন প্রতারণার মনস্তাত্ত্বিক রাজনীতি। এও তো যুদ্ধেত্তর ইওরোপের সঙ্খলিত সমাজচিত্র।

'দ্য কেয়ারটেকার' পিন্টারের একটি অতি জনপ্রিয় নাটক। প্রায় একবছর ধরে নিয়মিত চলেছিল নাটকটি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মঞ্চস্থ হয়েছিল। পিন্টার বলেছেন এই নাটকটির দৌলতেই তিনি তাঁর বুড়ো বাপকে কাজ ছেড়ে দিয়ে তাঁর কাছে ব্রাইটনে চলে আসতে বলেছিলেন, কারন নাটক তখন তাঁকে পয়সার মুখ দেখানো শুরু করেছে। নাটকে একটি বাড়ির কথা থাকলেও ঘটনাপ্রবাহ একটি ঘরের মধ্যেই আবদ্ধ। বাড়ির দুই ভাই অ্যাস্টন আর মিক ডেভিস নামে এক বাউন্ডুলেকে বাড়িটার কেয়ারটেকার করতে চায়। আর সে (বহিরাগত শক্তি) দুই ভাইয়ের মধ্যে ক্রমাগত সংঘাত বাঁধাতে চেষ্টা করে। এখানেও সেই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব।

১৯৫৭ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছরব্যাপী হ্যারল্ড পিন্টার তিরিশটিরও বেশি নাটক লিখেছেন। লিখেছেন ডজনাধিক নাট্যনকশা, দু'ডজন চিত্রনাট্য পরিচালনা করেছেন প্রায় চল্লিশটি নাটক, একটি চলচ্চিত্র ও ছ'টি দূরদর্শন প্রযোজনা। এ ছাড়া অভিনয় করেছেন অসংখ্য চরিত্রে। এই বিপুল সৃষ্টিসম্ভার ও মেধাপ্রদর্শন নিশ্চয়ই তাঁর নোবেল পুরস্কার যুক্তিসিদ্ধ করে। তথাপি ২০০৫ -এর সম্ভাব্য নোবেল তালিকার প্রথম সারিতে তাঁর স্থান ছিল না। বিশ্বজুড়ে যে সম্ভাব্য নামগুলি আলোচিত হয়েছিল তাঁরা হলেন টোমাস ট্রান্সটোমার (সুইডেন), জয়েস ক্যারল ওটেস (আমেরিকা), আদনিস (লেবানন), ওরহান পামুক (তুরস্ক) এবং আরও কেউ কেউ। তাই পিন্টারের নোবেল প্রাপ্তির খবর সারা বিশ্বের কাছে অনেকটাই ছিল চমকপ্রদ। স্বয়ং পিন্টারও বিস্মিত হয়েছিলেন। তখনও পর্যন্ত একটি একাঙ্ক ছাড়া তাঁর কোনও বই সুইডিস ভাষায় অনুদিত হয়নি। স্বভাবতই 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার প্রশ্নের উত্তরে পিন্টারকে বলতে হয় যে এই নির্বাচন তাঁকেও অবাক করেছে। এ সম্পর্কে সুইডিশ একাডেমির বক্তব্য তাঁর জানা নেই। তবে তাঁর রাজনৈতিক বক্তব্য এ কর্মকান্ডকে তাঁরা বিবেচনার মধ্যে এনে থাকতে পারেন। তা যদি হয় তবে একথা মানতেই হবে পিন্টারের মতো একজন প্রতিবাদী লেখককে পুরস্কৃত করে সুইডিশ একাডেমি কার্যত প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস বিরোধিতা, সর্বোপরি আমেরিকার মতো আধিপত্যবাদী শক্তির বিরোধিতাকেই স্বীকৃতি দান করল। কেননা এ সময়ে হ্যারল্ড পিন্টারই সেই 'রাগী' লেখক যিনি মাথা সোজা করে বলতে পারেন:

"The united States is a monster out of control. Unless we challenge it with absolute determination Amercan barbarism will destroy the world. The country is run by a bunceh of crminal lunctics, with Blair as their hired Chrstian thug."

অনেকে মনে করেন হ্যারল্ড পিন্টার লেখায় রাজনীতি নেই— তিনি রাজনীতিবিমুখ নাট্যকার। সেই কবে গত শতাব্দীর ছয়ের দশকে 'Politics do bore me' বলে রাজনীতিবিরোধী কিছু মন্তব্য করেছিলেন তা থেকে কেউ কেউ ধারণা করে নেন রাজনীতি থেকে শত যোজন দূরে তাঁর অবস্থান। অনেকে তাঁকে বুর্জোয়া ভাবধারার শূন্যবাদী দার্শনিকতায় মগ্ন এক উদ্ভট নাটককারের বেশি মর্যাদা দিতে পারেননি। কিন্তু আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা নেই যে সে বিমুখতা প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক দলবাজির বিরুদ্ধে। পৃথিবীতে এমন কোনও রাজনৈতিক দল থাকতে পারে না যার কোনও সুনির্দিষ্ট অ্যাজেন্ডা নেই। প্রতিটি দলই তার অ্যাজেন্ড বা কর্মসূচিকে ধ্রুব বলে মনে করে।

ব্যক্তি - মানুষ সে সবের সাথে সর্বৈব সহমত হতে পারে না। আর পিন্টারের মত তো ধ্রবসত্য বা ধ্রুবমিথ্যা বলে কিছু হয় না। অধিকাংশ রাজনীতিকই সত্যের চেয়ে ক্ষমতায়ন ও ক্ষমতা সংরক্ষণের প্রতি বেশি আগ্রহী থকে। তার নোবেল ভাষণের মধ্যে পিন্টার পরিষ্কার বলেছেন যে ইরাক আক্রমণের আগে বিশ্ববাসীকে নিশ্চিত করা হয়েছিল যে সে দেশের হাতে গণবিধ্বংসী ভয়ঙ্কর সব অস্ত্রশস্ত্র আছে, তার সাথে আলকায়দার সম্পর্ক আছে এবং সে আজ পৃথিবীর নিরাপত্তাকেই ভীতি প্রদর্শন করছে। পৃথিবীর মানুষকে এসব সত্য বলে নিশ্চয়তা দিলেও বাস্তবে তার কোনোটাই সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। প্রকৃত সত্য হচ্ছে বর্তমান পৃথিবীতে আমেরিকা তার ভূমিকাকে কীভাবে নিরুপণ করছে এবং কীভাবে তা রূপায়িত করতে চাইছে সেইটাকে ধরতে পারা।

বিশ্বরাজনীতিকে অনুধাবন করার এইযে বোধ বা উপলব্ধি তা অর্জন করার জন্য বিশেষ কোনও দলীয় রাজনীতির অনুগামী হতে হয় না। পিন্টার তা কিশোর বয়স থেকেই অর্জন করেছিলেন। হলোকাস্ট প্যারানইয়া থেকে উদ্ভুত সে বোধ বয়সের সাথে সাথে ক্রমশ বামপন্থী তথা মার্কসবাদী ধ্যানধারণায় পরিণতি লাভ করেছে। তাঁর নাট্যকার জীবনের প্রারম্ভিক কাজগুলির মধ্য থেকেই আমরা দেখি তাঁর ফ্যাসিবিরোধি চেতনার প্রতিফলন ও ক্রমবিকাশ।

শেষের দিকে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি আরও শাণিত হয়েছে। ১৯৮৪ সালে তুর্কী সরকারের নিষ্ঠুর দমনপীড়নের বিরুদ্ধে একটি আধঘন্টার নাটক লেখেন 'ওয়ান ফর দ্য রোড'। এ নাটক রীতিমতো ক্রোধের বশবর্তী হয়ে লিখেছিলেন। আবার ঘৃণার বশবর্তী হয়ে একটি নকশা লিখেছিলেন—'দ্য নিউ ওয়ার্লড অর্ডার (১৯৯১)। একই ব্যাপার ঘটেছিল তাঁর 'হটহাউস' লেখার সময় (১৯৮০)। সংখ্যালঘু কুর্দদের মাতৃভাষা নিষিদ্ধ করে তুরস্ক সরকার যে নিষ্ঠুর দমননীতির আশ্রয় নেয় তার প্রতিবাদে ১৯৮৮ সালে পিন্টার লেখেন 'মাউন্টেন ল্যাংগুয়েজ।' ১৯৯১ -এ লেখা 'পার্টি টাইম' -এর মধ্যেও রয়েছে প্রতিবাদী উচ্চারণ। ১৯৯৬-এ লেখা 'অ্যাশেস টু অ্যাশেস' এ রেবেকার স্মৃতিচারণের মধ্যে দেখা যায় মায়ের কোলের শিশুকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে, ভেড়ার পালের মতো বাস্তুহারা মানুষের ঢল। নিধন আর নির্যাতনের মধ্যে সে যেন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেরই বীভৎসাকে সামনে নিয়ে আসে। অতএব রাজনীতি-বিমুখ নাট্যকার হিসেবে চিহ্নিত করলে পিন্টারের প্রতি নির্মম অবিচার শুধু নয়, সত্যের অপলাপ করা হয়। তবে একথাও প্রসঙ্গত স্মরণে রাখতে হবে যে, যে-অর্থে ব্রেখট্ কিংবা পিসকাটর রাজনৈতিক নাট্যকার, সেই অর্থে পিন্টার রাজনৈতিক নাট্যকার নন। নির্দিষ্ট কোনও রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য ব্যতিরেকেও একজন লেখক, শিল্পী কিংবা সাধারণ মানুষ রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন হয়। পিন্টার তো প্রথম যৌবনেই ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছেন। ১৯৭৩ সালে সি. আই. এ-র চক্রান্তে চিলির রাষ্ট্রপতি আলেন্দে নিহত হলে তিনি সক্রিয়ভাবে মানবাধিকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন। স্বাধীন মতপ্রকাশের প্রবক্তা হিসেবে আন্তর্জাতিক PEN - এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন। PEN -এর হেলসিংকি ওয়াচ্ কমিটি মিশনের সদস্য হিসেবে ১৯৮৫ সালে আর্থার মিলারের সাথে তুরস্কে গিয়েছেন—লক্ষ্য ছিল সেখানকার জেলখানায় বন্দি লেখকদের ওপর অত্যাচারের তথ্যানুসন্ধান, সে বিষয়ে প্রতিবাদ ও মুক্তির আন্দোলন গড়ে তোলা। কুর্দিশ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার থেকেছেন। সক্রিয় সদস্য হয়েছেন স্লোদান মিলোসেভিচের সংগ্রামী সংগঠনের, ফিদেল কাস্ত্রো সমর্থক সলিডারিটি ক্যামপেনের। ব্রিটিশ নাগবিক হয়েও ব্লেয়ার - সরকারের এমন তীব্র সমালোচক বর্তমান সময়ে ব্রিটিশ লেখকদের মধ্যে আর কে আছেন? টনি ব্লেয়ার তাঁর চোখে 'deluded idiot.' ১৯৯৬ সালে তো প্রধানমন্ত্রী জন মেডরের তাঁকে নাইটহুড দেবার প্রস্তাব মুখের উপর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর আমেরিকা? আমেরিকার প্রশাসনকে তিনি তুলনা করেন হিটলারের থার্ড রাইখের সঙ্গে। তাঁর নিজের ভাষায় আজকের আমেরিকা হচ্ছে 'truely monstrous force in the world.' জর্জ বুশকে বলেন 'রক্তপিপাসু বন্য জানোয়ার' এবং ইরাকসহ বিশ্বব্যাপী গণহত্যার অপরাধে বুশ এবং ব্লেয়ারকেও আন্তর্জাতিক আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে চান। তাঁর নোবেল ভাষণে আমেরিকা আগ্রাসী বিদেশনীতির তীব্র সমালোচনা করে জানিয়েছেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পৃথিবীর ১৩২টি দেশে ৭০২ টি সামরিক ঘাঁটি নিয়ন্ত্রণ করে। তাঁর হাতে ৮০০০ তাজা পরমাণবিক যুদ্ধাস্ত্র আছে। সে আরও এমন শক্তিশালী মারণাস্ত্র উদ্ভাবন করছে যা ভূ-গর্ভস্থ আশ্রয়কেও গুড়িয়ে দিতে পারবে। তার রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রবিন্দুই হল পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকার ও তার ভীতিপ্রদ ব্যবহার। তার ঘোষিত নীতিই হচ্ছে সার্বিক প্রভুত্ব, অর্থাৎ ভূমি, সমুদ্র, আকাশও মহাকাশের উপর সর্বময় কর্তৃত্ব স্থাপন।

হ্যারল্ড পিন্টার তাঁর আকৈশোর - লালিত যুদ্ধবিরোধী, স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ও মানবতাবিরোধী মনোভাব কথায় ও কাজে জীবনভর বহন করে চলেছেন। একধরনের ফ্যানটাসি ও বাস্তবের সমন্বয়ে রচিত তাঁর নাট্যসাহিত্যে কমবেশি মনোভাবই ব্যক্ত করেছেন। সেদিক থেকে তাঁর অদৃশ্য কোনও রাজনৈতিক সূত্রধর বলে ভেবে নিতেও অসুবিধে নেই। আর তিনি নিজেও যখন বলেন, 'I am both deeply engaged in art and deeply engaged in ploitics and sometimes those two meet and sometime they don't. It's all going to be very interesting'—তখন তাঁকে কি আদৌ রাজনীতি - বিমুখ নাট্যকার বলে চিহ্নিত করা যায়? বরং বলা যায় যে, বর্তমান বিশ্ব-রাজনীতির অদ্ভুত অন্ধকারে জ্বলে থাকা এক জাগ্রত বিবেকের নাম হ্যারল্ড পিন্টার।

সৌজন্যে : গ্রুপ থিয়েটার

সহায়তা :

১. Modern British Dramatists : Edited by John Russel Brown,

২. নাট্যচিন্তা : হ্যারল্ড পিন্টার সংখ্যা ২০০৬

৩. একুশ শতাব্দী : জানুয়ারি - জুন ২০০৬: হ্যারল্ড পিন্টার : একটি যুদ্ধবিরোধী কণ্ঠ : সিদ্ধার্থ বিশ্বাস